# কন্যার প্রশ্ন

রমেন্দ্র নারায়ণ দে
লরেল, ম্যারীল্যান্ড

শ্রাবণীর ফোনটা রাখার পর থেকেই মন্দিরা ভাবছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না কিছুতেই কী এমন কথা শ্রাবণীর হঠাৎ মাথায় এল যে এক্কেবারে ফ্লাইটের দিন তাড়াহুড়োর মধ্যে ওকে আসতে হচ্ছে কথাটা বলার জন্য। মন্দিরা বলেছিল, কী এমন কথা যে তোমাকে আসতে হবে অতটা পথ! বল না, ফোনেই বল। আজ সন্ধ্যে রাতেই তো তোমার দেশে যাবার ফ্লাইট। গোছগাছের এত কাজের মাঝে এখন এতটা পথ.....।

গোছগাছ আমার হয়ে গেছে, মন্দিরার আপত্তি শেষ করতে না দিয়ে বলেছিল শ্রাবণী। দেশে ফিরে যাবার ঠিক আগে এই প্রশ্নটা করবে বলে অপেক্ষা করে আছে আজ তিন বছর। এই প্রসঙ্গে আলোচনার পর মন্দিরা মজুমদারের মুখ ও আর দেখতে চায় না, তাই প্রশ্নটা ধরে আছে শেষ সময়ের জন্য। সাধারণ হেসে বলেছিল, আমার ফ্লাইট ওকল্যান্ড এয়ারপোর্ট থেকে, সেখানে যাবার পথেই তো আপনার বাড়ি। আপনার সঙ্গে এই কথাটা না বলে দেশে যেতে পারছি না। বেশি সময় নেবো না।

সময়টা তো সমস্যা না। না হয় আজকে দুপুরের প্রিয় সোপ অপেরাটা দেখা হবে না। মন্দিরাকে বলতেই হয়েছে, আরে না না, আমার সময়ের কোন প্রবলেম নেই, বাড়িতেই তো আছি একা। এসো না, এসো।

কী এমন কথা? না বলে সে দেশে যেতে পারছে না! মন্দিরা আকাশ পাতাল ভেবে কোন কিছু ঠাহর করতে পারছে না। ওর এখানকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুস্মিতার বাড়িতে পরচিয় হয়েছিল মেয়েটির সঙ্গে। সুস্মিতার স্বামী প্রবাল বার্কেলেতে পড়ায়। সেই সুবাদেই দেশি ছাত্রী শ্রাবণীর সুস্মিতাদের বাড়িতে আসা। তারপর কথায় কথায় বেড়িয়েছে ও নাকি সুস্মিতার দাদার মেয়ের সঙ্গে পড়েছে দিল্লীতে জহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে। বিদেশে একা একটি বাঙালি মেয়ে, তারউপর ভাইঝির বন্ধু, সুস্মিতা তাই একটু খোঁজ খবর রাখে। বাড়িতে সব অনুষ্ঠান সব পার্টিতে ওকে নিমত্রণ করে, দেশ থেকে এতদূরে যাতে দেশের পরিবেশের কিছুটা অন্ততঃ পায়। সুস্মিতার বাড়িতে নানা পার্টিতে দেখা হয়ে হয়ে শ্রাবণীর সঙ্গে বেশ ভালই পরিচয় হয়ে গেছে মন্দিরার। কলকাতার মেয়ে, স্কলারশিপ নিয়ে পড়েছে দিল্লীতে, আর এখন এই বার্কলেতে। খুব ভাল ছাত্রী না হলে এমন করতে পারতো না। মেয়ের বয়সি মেয়ে। সুশ্রী সহজ বুদ্ধিমতী শ্রাবণীকে মন্দিরার ভালই লাগে। দু একবার শ্রাবণী মন্দিরাদের এই ওয়ালনাট ক্রিকের বাড়িতেও এসেছে সুস্মিতাদের সঙ্গে, মন্দিরারই নিমত্রণে। সুস্মিতাদের বাড়িতে দু সপ্তাহ আগের পার্টিতে জানতে পেরেছে শ্রাবণীর ডিসারটেশন ডিফেন্ড করা হয়ে গেছে। এখানের পড়াশুনা শেষ করে ও দেশে ফিরে যাচ্ছে। দেশে যাবার মুখে কী এমন কথা মনে পড়ল যে এতটা পথ আসতে হচ্ছে সেটা বলতে!

কথা মত দেড় ঘন্টার মাথায় পৌছে গেল শ্রাবণী। সঙ্গে লাগেজ দুটো স্যুটকেস। সেগুলো দরজার কাছে রাখিয়ে মন্দিরা ওকে এনে বসাল বসার ঘরে। বলল, তোমাদের মত আজকালকার ছেলেমেয়েদের আমরা বুঝতে পারি না। কী এমন কথা মাথায় এল হঠাৎ যে অতটা পথ দৌড়াতে হল তোমাকে।

হাসল শ্রাবণী। বলল, হঠাৎ না, আর কথাটা আসলে একটা প্রশ্ন।

ও, মন্দিরা একটু থমকালো। ভাবল হঠাৎ না, মানে কথাটা ছিলই। সেটা আবার একটা প্রশ্ন! তাও আমার কাছে? ভাবতে ভাবতে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। আগে বল কী খাবে। খেতে খেতে তোমার প্রশ্ন শোনা যাবে অখন।

খাবার ব্যাপারে এক কথায় রাজী শ্রাবণী। মন্দিরা বলল যে ও আসছে বলে সে ও লাঞ্চ না খেয়ে অপেক্ষা করছিল দুজন একসঙ্গে খাবে বলে। খাবার নিয়ে টেবিলে মুখোমুখি বসল দুজনে। খেতে খেতে ঘরের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখছিল শ্রাবণী। আগেও খেয়াল করেছে, এখন আরো বিশেষ করে দেখল, পরিপাটি গোছানো ঘর সংসার। প্রত্যেকটা জিনিষ জায়গা মত যথাযথ ভাবে রাখা, সঠিক সুন্দর পরিকল্পনায়। চারদিকে পরিচ্ছন্ন পূর্ণতার ছবি। চায়না ক্যাবিনেটের বিপরীত দিকের দেয়ালে বড় ছবিটা, স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে ছেলে, গ্রাজুয়েশনের পোশাকে। মন্দিরা মজুমদারের এই ছেলেকে কোনদিন দেখেনি শ্রাবণী। বলল, ঐ বুঝি আপনার ছেলে?

ছবিটার দিকে ঘুরে তাকিয়ে মন্দিরা বলল, হ্যাঁ, ঐ আমার পুত্রধন। দেশোদ্ধারের কাজে লেগেছে। আর্মিতে আছে।

ও।

মন্দিরা তারপর বলল, দুটো উইকয়েন্ড আগেই তো সুস্মির বাড়িতে দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে, তখনই তো জিজ্ঞাসা করতে পারতে কী তোমার প্রশ্ন। তাছাড়া, আজ ও তো ফোনে....

মন্দিরার কথা শেষ করতে না দিয়ে শ্রাবণী বলল, আমি আপনার সঙ্গে কথাটা বলতে চাই ফেস টু ফেস। আর সুস্মিতা পিসির বাড়িতে এত লোকজনের মাঝে বলতে ইচ্ছা করছিল না।

ও, তো বেশ, এখন তো তোমার মনের মত পরিবেশ পেলে। বল শুনি কী তোমার প্রশ্ন।

আসানসোলের রেল কলোনীর কথা আপনার কিছু মনে আছে?

চমকে উঠল মন্দিরা শ্রাবণীর প্রশ্নে। এই মেয়েটি ওর আসানসোলের অতীতের কথা জানল কী করে! কোনদিন তো ওর সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। ওর সঙ্গে কেন, মনে হয় না সুস্মিতার সঙ্গেও কোনদিন আসানসোল নিয়ে বিস্তারিত কোন আলোচনা হয়েছে। সুস্মিতা জানে মন্দিরার বাবা রেলে কাজ করতেন। জানে মন্দিরার ছোটবেলা আসানসোলের রেল কলোনীতে কেটেছিল। ব্যাস। এর বেশি কোন কথা হয়েছে বলে তো ও মনে করতে পারছে না। শ্রাবণীর প্রশ্নে অবাক হলেও, সেটা নিজের ভিতরে সামলে নিয়ে মন্দিরা বলল, মনে থাকবে না কেন, ছোটবেলার কথা কি কেউ ভুলতে পারে? তো তুমি আমার আসানসোলের কথা জান কী করে?

বিষদ্ কিছু জানি না। এ টুকু জানি যে আপনার স্কুল লাইফ, তারপরে আবার বিয়ের আগে পর্যন্ত চাকরি জীবন, কেটেছিল আসানসোলে।

ঠিক। মাঝখানের ক'টা বছর আমি কলকাতায় ছিলাম। দাদা আর আমি দুজনকে কলকাতার হষ্টেলে রেখে পড়াতে বাবার বেশ কষ্ট হত। কিন্তু আমাদের বাবা মাদের কাছে সে সব কষ্ট কোন ব্যাপারই না।

ঠিক বলেছেন, শ্রাবণী যোগ দেয়, আমার বাবাও মেয়ের জন্য সমস্ত কষ্ট মেনে নেয় হাসি মুখে।

তুমি তো আর আমাদের মত না, মন্দিরা হাসিমুখে বলল, তুমি ভালছাত্রী, স্কলারশিপ নিয়ে পড়েছো আগাগোড়া। আমার বাবার মত তোমার বাবাকে তো টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি।

তা হয়নি। কিন্তু আপনজন কেউ কাছে না থাকা, সে আরো বড় কষ্ট।

সেটা ঠিক। তো তোমার আর কোন ভাই বোন নেই? তোমার মা?

নাহ্, আমার আর কোন ভাই বোন নেই, আমি একমাত্র সন্তান। একটুক্ষণ চুপ করে কি ভাবল শ্রাবণী। তারপর আবার বলতে শুরু করল, আমার মা অসুস্থ ছিলেন শেষজীবনে অনেকদিন। বাবার তখন বিশ্রাম ছিল না বিন্দুমাত্র। দিনে অফিসের কাজ, রাতে বাড়ির কাজ, রুগীর সেবা। আমি তখন দিল্লীতে। আমি দিল্লী যেতে চাইছিলাম না বাবা মাকে ঐ অবস্থায় ফেলে, কিন্তু আপনি বললেন না আমাদের বাবা মাদের কাছে সে সব কষ্ট কোন ব্যাপারই না। বাবা কিছুতেই আমার জে এন ইউ'র স্কলারশিপটা বিফলে যেতে দেবে না।

বটেই তো, মন্দিরা বলল, বাবা হয়ে মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারেন নাকি!

ঠিক বলেছেন। মেয়ের ভাল ভবিষ্যৎ বাবা তো চাইবেনই। কিন্তু মেয়ের কী তাই বলে নির্দ্বিধায় নিজের আখেরটা গুছিয়ে নেয়া ঠিক?

কী বলছো তুমি শ্রাবণী? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মন্দিরা দেখল শ্রাবণী কোন কথা না বলে শুধু হাসছে ম্লান। আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার আসল প্রশ্নটা কী শ্রাবণী?

আপনি যখন আপনার বাবার আনা আমেরিকায় এই বিয়ের সম্বন্ধটা স্বীকার করেছিলেন, তখন নিজের ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কোন চিন্তা আপনার মাথায় ছিল কী?

কী সব প্রশ্ন তুমি করছো? বিরক্ত গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল মন্দিরা, তোমাকে কিছুটা স্নেহ করি বলে তোমার কী করে মনে হল তুমি এমন সব প্রশ্ন আমাকে করতে পার! এই সব উল্টোপাল্টা কথা বলার জন্য তুমি এসেছ এতটা পথ? তাও জার্নির দিনের তাড়াহুড়োর মধ্যে!

মন্দিরার কথার ঝাঁঝে শ্রাবণীর কোন বিকার হল না। সহজ ভাবে বলল, আমার প্রশ্নটার উত্তর দেশে যাবার আগে দরকার বলেই তো ছুটে এসেছি।

কী বলছো তুমি শ্রাবণী! তোমার দেশে যাবার আগে আমার বিয়ের কথার খবরে কী প্রয়োজন তোমার? এত দিন আগের একটা কথা আজ এত দরকারী কেন তোমার কাছে?

এই প্রশ্নটার উত্তর আমার কাছে কত দরকারী আপনার কোন ধারণা নেই।

কেন শ্রাবণী? কেন?

আমি জানতে চাই আমার বাবার সারাজীবনের বিষাদের কোন মূল্য আছে কিনা।

তোমার বাবা! মন্দিরার চোয়াল যেন ঝুলে পড়বে। তবুও কোন রকমে জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা কে শ্রাবণী?

আমার বাবা দীপঙ্কর সামন্ত।

দীপঙ্কর সামন্ত! এক লহমায় মন্দিরার মনের উপর দিয়ে দুর্বার গতিতে বয়ে গেল অতীতের মিছিল। আসানসোলের কোয়ার্টার্স পাড়া। দাদার বন্ধু, লাজুক লাজুক ভালমানুষ ছেলে দীপঙ্কর সামন্ত। স্কুলে যাবার পথে মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যেত। ছাতা মাথায় দিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, তেল চকচকে পাটপাট চুল, জুলপি দিয়ে তেল গড়াচ্ছে, এমন ক্যাবলা ছেলেকে নিয়ে ওরা বন্ধুরা হাসাহাসি করত। মাঝে মধ্যে দাদার কাছে কোন বই টই এর জন্য আসত সে, কিন্তু পারতপক্ষে মন্দিরার দিকে চোখ তুলে তাকাত না। তখন মন্দিরা ক্লাস টেন এ পড়ে। পূজার অষ্টমীদিন শাড়ি পরে বন্ধু মলিনার সঙ্গে টাউনে গিয়েছিল ঠাকুর দেখতে। টাউনের বড় পূজা ছাত্রবন্ধু ক্লাবের প্যান্ডাল থেকে ছেলে দুটো পিছন নিয়েছিল, বাজে বাজে কথা আর টিটকিরি। মলিনা বলেছিল চল বাড়ি চলে যাই ম্যান্ডি। মন্দিরা রাজী হয়নি, দুটো চ্যাংড়া ছোকরার জন্য পুজোর আনন্দ মাটি করব নাকি, রাখ তো। কিছু দূর যেতে দুজন থেকে তারা হয়েছিল চার, কমে আসছিল দূরত্ব, আর টিটকিরিতে বদমায়েশির মাত্রা যাচ্ছিল বেড়ে। তখন মন্দিরাও বেশ ভীত। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ততক্ষণে ওরা যেখানে এসে গেছে সেখান থেকে বাড়ীর দিকে যেতে গেলে পিছন ফিরতে হবে। আর পিছন ফিরলেই তো চ্যাংড়াদের দলটার মুখোমুখি হতে হবে। সামনে আশেপাশের রাস্তাগুলো বাড়ির দিকে নয় একদম। বিপদে পড়ে মন্দিরারও তখন বেশ বুক ধরফর করছিল, তারউপর মলিনার অভিযোগ। ওর কথামত আরো আগেই ওদের বাড়ির পথ ধরা উচিৎ ছিল। এমনি সময় হঠাৎ কোথা থেকে দাদা দলবল নিয়ে এসে হাজির হয়ে গিয়েছিল, আর চ্যাংড়াগুলোও তখন তাড়া খেয়ে দৌড়ে উধাও। দাদা খুব বকা দিয়েছিল সঙ্গে কোন গার্জেন ছাড়া বাড়ি থেকে এত দূরে ঠাকুর দেখতে আসার জন্য। বলেছিল, ভাগ্যিস ব্যাপারটা দীপুর চোখে পড়েছিল। দীপু ছুটে গিয়ে আমাদের না বললে কী হত আজকে শুনি? এ গুলো মটরষ্ট্যান্ডের বখাটে হ্যান্ডিমান ছোকরা, মদের নেশায় ওদের মাথার কোন ঠিক আছে!

ক'দিন পরে পাড়ার ক্লাবে বিজয়া সম্মিলনীর সান্ধ্য-জলসায় দেখা হয়েছিল দীপঙ্করের সঙ্গে। মন্দিরার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সরে যাচ্ছিল সে, পিছন থেকে ডেকেছিল মন্দিরা। দীপঙ্কর ঘুরে দাঁড়ালে বলেছিল, সেদিনের জন্য থ্যাঙ্কস।

না না, থ্যাঙ্কসের কী আছে, দীপঙ্কর বলেছিল যথেষ্ট সঙ্কুচিত ভাবে। চোখ মাটির দিকে।

বাহ্ থ্যাঙ্কসের কিছু নেই, এত বড় একটা মুশকিল থেকে বাঁচালেন।

ও কিছু না, দীপঙ্করের চোখ তখনো মাটির দিকে।

হঠাৎ বেশ রাগ হয়েছিল মন্দিরার, মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না এই ছেলেটা, ও কী অতই বাজে দেখতে! মুখ চিবিয়ে বলেছিল, বীরপুরুষ আপনি নিজে ঐ ছেলেগুলোকে চ্যালেঞ্জ করলেন না কেন। দাদার কাছে কেন বললেন দৌড়ে গিয়ে। আমাকে বকা খাওয়ানোর জন্য?

এবার চোখ তুলে সোজা মন্দিরার চোখে তাকিয়েছিল দীপঙ্কর। বলেছিল, বীরপুরুষ আমি না, আর বোকা তো নই ই। একা আমি ওদের চারজনের সঙ্গে পারতাম না। একা পরতো না তোমার দাদাও। তোমার কাছে বাহাদুর হওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। একটা ঝামেলাকর অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য যা সঠিক মনে হয়েছে তাই করেছি।

কথা কটা চড়চড়িয়ে বলে চলে যাচ্ছিল দীপঙ্কর। হঠাৎ পিছন ফিরে আবার বলেছিল, তোমার বকা খাওয়া আমার ভাল লাগেনি, কিন্তু আমাকে বলতেই হবে, সেটাও হয়েছে উচিৎ মতই।

দীপঙ্কর আর মন্দিরার জীবনের পরের ক'বছর প্রেমে পড়া তরুন তরুণীর যুবক যুবতীর উচ্ছলতার, উদ্দামতার, আকুলতার সহজ কাহিনী। দুজনের মনে এমনই মিলের টান, যেন বাকী জীবনের ইতিবৃত্ত পাথরে খোদাই করে লেখা হয়ে গেছে। স্কুল শেষ করে মন্দিরা কলকাতায় আসতে শুরু হয়েছিল আরেক অধ্যায়। মন্দিরা আর দীপঙ্কর দুজনেই কলকাতায় হষ্টেলে, তাই যথেচ্ছ স্বাধীন। অবাধ মেলামেশায় নেই কোনই বাধা। দাদাও

আছে কলকাতায় আরেক হষ্টেলে, কিন্তু এতবড় কলকাতা শহরে এক দাদার দুচোখকে ফাঁকি দেয়া কী এমন কঠিন কাজ। কিন্তু উপারওয়ালার চোখকে ফাঁকি দেয়া যায় না, আর সম্ভবতঃ তাঁর খোলা অনুমোদন ছিল না ওদের অবাধ মেলামেশায়। মন্দিরা কলকাতা আসার পরের বছর হঠাৎ ষ্ট্রোকে মারা গেলেন দীপঙ্করের বাবা। বাড়ির বড় ছেলে, ছোট দুই বোন এক ভাই আর বিধবা মার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে দীপঙ্কর দিশেহারা। কলকাতায় থেকে পড়া তখন দাঁড়িয়ে গেল বিলাসিতায়। আসানসোলে ফিরে এসে সংসারের হাল ধরা ছাড়া অন্য কোন পথ দেখতে পায়নি দীপঙ্কর। ভাগ্যের বিপাকে নিজের অসমাপ্ত পড়াশুনা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে হতাশায় ছটফট করেছিল দীপঙ্কর। বলেছিল, মন্দির, তোমার উপযুক্ত হতে আমি পারব না আর কোন মতে।

কী সব বলছো তুমি, মন্দিরা ওকে মনের বল হারাতে দিতে পারে না। দীপঙ্করের হাত ধরে বলেছিল, আমার উপযুক্ত তুমি সবসময়। আমি আছি তোমার পাশে। তুমি মন ছোট করবে না একদম।

আসানসোলে ফিরে দীপঙ্কর তুলে নিয়েছিল সংসারের সব দায় দায়িত্ব। সারাদিন কাজ, সন্ধ্যারাতে নাইট কলেজ, আর রাত জেগে পড়াশুনা। মন্দিরার চিঠি আসে নানা উৎসাহের কথায় ভরা। সে নিজেও আসে আসানসোলে ছুটিছাটা পড়লেই। বার বারই বলে, জীবন যত কঠিন পরীক্ষায়ই ফেলুক, ওরা দুজন উৎড়ে যাবে ঠিক, একে অন্যের হাত ধরে। দেখতে দেখতে মন্দিরার এম এ হয়ে যায়। আসানসোলে ফিরে মন্দিরা চাকরি নেয় একটি বাচ্চাদের স্কুলে পড়ানোর। ততদিনে দাদা পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার, কলকাতায় ভাল চাকরিতে। বাবা রিটায়ার করলেন, রেলের কোয়ার্টার্স চলে গেল। দাদা চাইল সবাই কলকাতা ওর কাছে চলে আসুক, কিন্তু মন্দিরা কিছুতেই আসানসোল ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না। সংসারে শুরু হয়ে গিয়েছিল অঘোষিত একটা যুদ্ধ। ততদিনে সবাই জেনে গেছে মন্দিরা আর দীপঙ্করের কথা। সবার ঘোরতর আপত্তি। পাশ না করা, এদিক সেদিক উল্টোপাল্টা কাজ করে কোন রকমে এতবড় একটা সংসার চালানোর বোঝা যার ঘাড়ে, সে মন্দিরার মত মেয়ের উপযুক্ত না কোন রকমেই। মন্দিরা যেমন দেখতে শুনতে ভাল, তেমনি লেখাপড়া জানা, চাকুরে মেয়ে। দাদাতো কলকাতা থেকে এসে অনেক কথা শুনিয়ে গেল দীপঙ্করকে। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে বলেছিল, ছোটবেলার বন্ধু, তোকে ভালছেলে বলেই জানতাম দীপু। কোনদিন বুঝতে পারিনি ভাল মানুষের খোলসে পেটে পেটে তোর এমন বদ মতলব। তোর নিজের মুরোদ তো সবার জানা, ভেবেছিস চাকরি করা বৌয়ের পয়সার রোয়াবি করবি। আমরা তা হতে দেবো না কোন রকমেই, এই তোকে বলে গেলাম।

দীপঙ্করের মা আড়ালে কাঁদলেন, কাঁদল বোনেরাও। বাড়ির ছেলের এমন অপমান সহ্য করা সহজ না। কিন্তু কেউ কিছু বলল না, কারণ তারা জানে না এই পরিস্থিতিতে দীপঙ্কর কি ভাবছে, মন্দিরা কি করবে। দীপঙ্কর মন্দিরাকে বলেছিল ভাগ্য মেনে নিতে। বলেছিল, মন্দির, এই সমাধান আমার জন্যও সহজ না একফোঁটাও, কিন্তু বাড়ি সবার বিপক্ষে গিয়ে জেদের বশে আজ যা ঠিক মনে করছো, কাল না তার জন্যে পস্তাও।

চোখে ক্রোধের দীপ্ত দৃষ্টি। মন্দিরা বলেছিল, সবাই যদি আমার বিপক্ষে যেতে চায় তো আমিও সবার বিপক্ষে। ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়ির সবাই তোমাকে জানে চেনে। কী করে তারা বলে তুমি মতলবি ছেলে! তোমার যে অবস্থার পরিহাস ওরা করছে, সেটাতে তোমার করার ছিল কী? ওদের বরং বোঝা উচিৎ কতবড় দায়িত্ব তুমি সামলাচ্ছো। না, আমি কোন রকমেই তোমাকে ছাড়তে পারব না।

মন্দিরার জেদ শেষপর্যন্ত টেকেনি। একের পর এক বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করেছে, কিন্তু দাদার আনা আমেরিকার এই সম্বন্ধটাতে অমত করতেই বাড়িতে শুরু হয়ে গিয়েছিল তুমুল ঝগড়া। কথা কাটাকাটির মধ্যে বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। তারপর ক'দিন যমে মানুষে টানাটানি। দাদা কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল। মা তো কথা বলেই না, কেবল কাঁদে আর বলে, এতবড় শত্রু ধরেছিলাম নিজেরই পেটে, ভগবান কতবড় শাস্তি আমাকে দিলে! ডাক্তার মন্দিরাকে আড়ালে ডেকে বলেছিল, আপনার বাবার হার্টের অবস্থা ভাল না মোটেই, কোন রকমে চলছে টিকটিক করে। আর একটু ধাক্কা পড়লেই থেমে যাবে এক্কেবারে।

মন্দিরার পাগল পাগল অবস্থা, কী করে সে এখন, কী করে! ঝরঝর করে জল গড়াচ্ছে দুচোখে। দীপঙ্করের দুহাত ধরে বলেছিল, বাবার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারছি না, মার বিলাপ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি কী করি বল, তুমি বলে দাও আমি কী করি।

মন্দিরার গালে গড়ানো চোখের জল মুছে দিতে দিতে ভবিতব্য মেনে নেবার দীর্ঘশ্বাসটা নিজের বুকে চেপে দিয়েছিল দীপঙ্কর। বলেছিল, আজ যেমন তুমি বাবার দিকে তাকাতে পারছো না, তেমনি ভগবান না করুন, বাবার যদি এ জন্যে কিছু হয়ে যায় তখন তুমি আমার দিকে তাকাতে পারবে না বাকী জীবন।

সে ভয় করছে আমারো, ভয় করছে ভীষণ, মন্দিরার চোখেমুখে চরম আতঙ্ক।

ম্লান হেসে মন্দিরার দুহাত ধরে দীপঙ্কর বলেছিল, ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি মন্দির। তোমার জেদটাই ছিল আমার বিশেষ বল, তাই আমার থেকে বেশি হারলে তুমি। এতদিন ধরে ভয়ে সযত্নে লালন করা সুন্দর স্বপ্নের সমাধি মেনে নিতে থরথর করে কাঁপছিল দীপঙ্করের গলা। তবুও বলেছিল, আমি বুঝতে পারি তোমার কষ্ট অনেক বেশি, তবুও সয়ে নিতে তো হবে।

তোমাকে ছাড়া আমি থাকব কী করে? মন্দিরার অস্থির ছটফটানি।

সহজ হবে না একটুও। দীপঙ্করের হতাশ গলা।

না, আমি পারব না, পারব না।

বাবার কিছু হয়ে গেলে সারাজীবন নিজের কাছে অপরাধী হয়ে থাকবে। অপরাধী করবে আমাকেও।

না না, তোমাকেও আমি অপরাধী করতে পারব না।

কাতর দুটি আত্মা কে বোঝাবে কাকে? বোঝাবে কী? বোঝ অবুঝের প্রলাপ চলেছিল দীর্ঘ সময়, তারপর এক সময় এসেছিল মেনে নেবার পালা। বুকে পাথর বাঁধা দীপঙ্কর রোরুদ্যমান মন্দিরাকে দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিল বিদেশে গিয়ে যেন কোন যোগাযোগ আর না রাখে, তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্টের হবে না শেষ।

যোগাযোগ না রাখলেও খবর রেখেছিল মন্দিরা। খবর রেখেছিল দীপঙ্করের বিয়ের সংবাদ শোনা পর্যন্ত। সে খবরটা শোনার পর একটা অজানা কষ্টে ভরে গিয়েছিল বুকটা। সেদিন মনে হয়েছিল চূড়ান্ত বিদায়ের সময় এসে গেল শেষপর্যন্ত। দীপঙ্করের জীবনে আর ওর কোন স্থান নেই। মনে হয়েছিল এরপর আর দীপঙ্করের খোঁজ রাখা যেন দীপঙ্করের নিজস্ব জীবনে নাক গলানোর মত। আস্তে আস্তে দীপঙ্করের সব কথা সব স্মৃতি মনের অতলে এক কোণায় একটা ভুলে যাবার কোঠরীতে ভরে সরিয়ে রেখেছিল মন্দিরা। আজ এই মেয়েটি, শ্রাবণী, কোন অতীতের মিছিলে ফেলে দিল মন্দিরাকে হঠাৎ! শ্রাবণী দীপঙ্করের মেয়ে! বুকের মধ্যে চলতে থাকা হাপড়ের চাপ দম ধরে সামলে নিয়ে মন্দিরা বলল, তুমি দীপুদার মেয়ে! কোনদিন বলনি তো।

সময়মত বলব বলে রেখে দিয়েছিলাম, শ্রাবণী সাবলিল গলায় বলল, আজ সে সময় এসেছে।

রেখে দিয়েছিলে? মন্দিরা অবাক, তুমি এই কথাটা জেনেশুনে রেখে দিয়েছিলে উপযুক্ত সময়ের জন্য!

হ্যাঁ, সে রকমই। আমি আমেরিকার যে কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যেতে পারতাম, কিন্তু যাইনি। আমি আসতে চেয়েছিলাম এই ওয়ালনাট ক্রিকের কাছাকাছি।

কেন? মন্দিরার অধীর প্রশ্ন।

আমি দেখতে চেয়েছিলাম মন্দিরা মজুমদার কেমন আছেন। আপনাকে আগেই বলেছি, আমি জানতে চাই আমার বাবার সারাজীবন উদাসী হয়ে থাকার কী কোন মূল্য আছে?

প্রাথমিক বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে মন্দিরা এতক্ষণে কিছুটা গুছিয়ে নিতে পেরেছে নিজেকে। বলল, দীপুদাকে আমি যতটা জানি, নিজের বিষাদ প্রচার করে বেড়াবার মত মানুষ সে না। তুমি তার হদিশ পেলে কী করে?

ঠিক বলেছেন, শ্রাবণী মানল, নিজের দুঃখ কষ্ট নিজের ভাবনা শেয়ার করার স্বভাব বাবার নেই একদম। কেবল আপনমনে একা একা জীবন কাটিয়ে দেয়া কোন রকমে।

কেন এমন কথা বলছো শ্রাবণী? দীপুদা যদি কিছু না ই বলে থাকে তাহলে কোন আন্দাজে তুমি এই সব কথা বলে চলেছো?

বাবা কিছু বলেনি, কিন্তু বাবার সঙ্গে সারাটা জীবন যে কাটিয়েছে ভালবাসাহীন সে বলেছে।

কী বলছো তুমি শ্রাবণী? মন্দিরার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে আর্তস্বর।

হ্যাঁ, আমার মার কষ্টের হদিশ আমি পেয়েছি তাঁর মৃত্যুশয্যায়।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল শ্রবণী। মন্দিরা পুরোপুরি দিশেহারা। কাছে এসে শ্রাবণীর কাঁধে হাত রেখে ওকে শান্ত হতে বলল চোখের ভাষায়। কী বলবে যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না মন্দিরা। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল শ্রাবণী, আবেগে থরোথরো গলা। বলল, কোন নালিশ মার ছিল না। নালিশ করার মত কোন কিছু তো বাবা করেনি কোনদিন। সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালনে, আমার কি মার প্রতি কর্তব্যে, কি আমাদের কোন ইচ্ছাপূরণে, বিন্দুমাত্র গাফিলতি বাবার ছিল না একদিনের জন্যেও। রোগে শয্যাশায়ী স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ যোগাতে আরো রোজগারের চেষ্টা, তারউপর তার সেবা শুশ্রূষা করার পরিশ্রমে ক্লান্ত বাবাকে একবারের জন্যও হাঁপিয়ে পড়তে দেখিনি।

এসব আমাকে বলতে হবে না শ্রাবণী, মন্দিরা এতক্ষণে কথা বলার দম ফিরে পেয়েছে, আমি তোমার বাবার স্বভাব জানি।

তাই বলছি, আমার মা বাবার নামে নালিশ করতে আমাকে কিছু বলেনি। বাবাকে অসম্ভব ভালবাসতো বলেই মা বুঝতে পারতো বাবার মনের ছোঁয়া মা পেল না। শেষ সময়ে আমাকে মা আক্ষেপ করে বলেছিল, শুভি, তোর বাবার মনের অভাব আমি পূর্ণ করতে পারলাম না কোনদিন। জানতেও পারলাম না এই অপূর্ণতার....

শুভি! মন্দিরা মাঝখানে না বলে পারল না, তোমার নাম তো শ্রাবণী।

হ্যাঁ, মা আমাকে শুভি বলে ডাকতো। এতক্ষণে হালকা একটা হাসি এল শ্রাবণীর মুখে। বলল, মার কাছে শুনেছি বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে হোক, নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখবে শুভঙ্কর। মেয়ে হতে মার নামের সঙ্গে মিলিয়ে বাবা নাম দিল শ্রাবণী। মা কিন্তু আজীবন আমাকে শুভি ডেকে গেল।

হাসল মন্দিরা। বলল, আমি বুঝতে পারছি তারপর তুমি খবর করে বের করেছো তোমার বাবার জীবনের অপূর্ণতার কারণ আমি।

হ্যাঁ। তাই বেছে বেছে আমার বার্কলেতে পড়তে আসা। তিন বছর ধরে আপনাকে কাছে থেকে দেখা, আর সারাক্ষণ আমার তাজ্জব হয়ে যাওয়া। আপনার কোন অপূর্ণতার ছায়াও তো চোখে পড়ল না। দিব্যি তো আছেন মনের আনন্দে। কখনো আমার বাবার কথা মনেও পড়েনি, না?

এমন কঠিন প্রশ্ন কত সোজাসুজি করছে মেয়েটা। এখন কি মন্দিরা ওকে বলতে পারবে, কী পরিস্থিতি তে ওরা একজন আরেকজনকে ছাড়তে হয়েছিল বাধ্য! বলতে পারবে কি, ওর বাবা কী অঙ্গীকার ওকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিল। বলতে পারবে কী অতীতের অনেক কথাই ভুলে থাকা যায়, ভুলে যাওয়া যায় না। এসব কথা বলা যাবে না, বলা সম্ভব না। ঢোক গিলে মন্দিরা বলল, আমাদের ছাড়াছাড়িতে আমার বাড়ির একটা বড় সমস্যা মিটে ছিল। তাই ক্ষতির মধ্যেও আমার ছিল কিছু প্রাপ্তি। দীপুদার কেবলই ক্ষতি, তাই অনুমান করি বিষাদও হয়েছে তার আমার থেকে বেশি।

বেশি? শ্রাবণী খরখরে গলায় বলল, একটা মানুষ গুমরে গুমরে ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে গেল সারাটা জীবন। অন্যদিকে আপনার সবই সাজানো, গোছানো, পরিপূর্ণ।

ম্লান হাসল মন্দিরা। বলল, ভগবানের কৃপায় আমার সংসারে অপূর্ণতার সত্যিই কিছু নেই। আর স্বামী ছেলে সংসারের প্রতি আমারো তো আছে কর্তব্য।

উঠে দাঁড়াল শ্রাবণী। বলল, আমার যা জানার ছিল তা হয়ে গেছে, এবার আমি যাব।

উঠে দাঁড়াল মন্দিরাও। দীপুদার মেয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, কোথায় একটা মিল আছে বাপ মেয়ের আদলে। এতদিন বুঝতে পারেনি কেন ও! মন্দিরার মনে হল কাছে টেনে মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করে। হু হু করতে থাকা মনটা যেন চিৎকার করে বলছে, শ্রাবণী, এই যে এত কাছে থাকা সত্ত্বেও দীপুদার টুকরো তোমাকে বুকে টেনে নিতে পারলাম না, এই অপূর্ণতার তুমি কী কিছু বোঝ? মুখে বলল, শ্রাবণী, একটু দাঁড়াও, একটা জিনিস নিয়ে যাও।

কী?

নিয়ে আসছি, দাঁড়াও একটু।

ঘরের ভিতরে গিয়ে একটা খাম নিয়ে এল মন্দিরা। শ্রাবণীর হাতে দিয়ে বলল, বাবাকে দিও।

শ্রাবণী দেখল খামটার উপরে ওর বাবার নাম আর ওদের আসানসোলের বাড়ির ঠিকানা লেখা। শ্রাবণী কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে মন্দিরা বলল, অনেকদিন আগে দীপুদাকে লিখেছিলাম, পাঠানো হয়নি।

ফোনে একটা ট্যাক্সি ডেকে লাগেজ দুটো নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছালো শ্রাবণী। তারপর চেকইন করা, সিকিউরিটি চেক, ফ্লাইট ডিপারচারের অ্যানাউন্সমেন্টের অপেক্ষা, পুরোটা সময় শ্রাবণী একটা অস্বস্তি নিয়ে কাটিয়ে দিল। কেমন যেন একটা অর্থহীন কাজে কেটে গেল পুরো বিকেলটা। শ্রাবণী যেন নিজেই ভেবে পাচ্ছে না কী শুনবে আশা করে ও মন্দিরা মজুমদারের কাছে গিয়েছিল। অপ্রয়োজনীয় অতীত ভুলে যাওয়াই এই ধরনের মহিলাদের স্বভাব। তবুও বেরোবার মুখে মন্দিরার ছলছলে চোখ যেন এই স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। বলছিল, যদি পার বাড়ি পৌঁছে একটা ফোন করে দিও। ফ্লাইট টেকঅফ করার পর সুস্থির হয়ে বসতে আবার শ্রাবণীর ভাবনায় বিকেলের কথা উঠে এল, আর তখনই মনে পড়ল মন্দিরা মজুমদার বাবার কাছে একটা চিঠি দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবণীর মনের পর্দায় ভেসে উঠল বাবার শ্রান্ত অবষণ্ন মুখটা। নাহ, বাবার কাছে আজে বাজে চিঠি সে পৌঁছে দিতে পারবে না। বাবার বিন্দুমাত্র কষ্ট হতে পারে এমন চিঠি শ্রাবণী বাবাকে দেবে না। কী লিখেছে মন্দিরা মজুমদার? শ্রাবণীকে জানতেই হবে চিঠির বিষয়বস্তু কী। হাতব্যাগ খুলে খামটা বের করল শ্রাবণী, খামটা ছিঁড়ে মেলে ধরল ভাঁজ করা কাগজটা। উপরে লেখা তারিখটা প্রায় ছাব্বিশ বছর আগের। হ্যাঁ, ১৯৭৯ সালের তারিখ। শ্রাবণীর মনে পড়ল মন্দিরা মজুমদার বলেছিল চিঠিটা অনেকদিন আগে লেখা। কাগজটার নিচের দিকে চোখ নামাল শ্রাবণী। সেখানে লেখা শুধু গুটিকয় কথা -

তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কোনদিন যোগাযোগের চেষ্টা করব না। করিনি আজ তিন বছর হয়ে গেল। আজ লিখছি তোমার কাছে, তবে প্রতিজ্ঞা ভেঙে পাঠাতে পারব কিনা জানি না। তোমার তো কত কত আগাম জল্পনা ছিল, মনে আছে? আজ তোমার তেমনি একটি ভাবনার কথা মনে পড়ছে খুব। আমার ছেলে হয়েছে। তুমি যেমন ভেবেছিলে তেমনই করেছি, নাম রেখেছি "শুভঙ্কর"।

লরেল, ম্যারীল্যান্ড
ডিসেম্বর ৮, ২০০৫